রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

রফিকুল ইসলাম*

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় যে নজরুলের কলকাতায় সাংবাদিক সাহিত্যিক জীবন সূচনার পূর্ব থেকেই, করাচি সেনানিবাস বা স্কুল জীবনেই ঘটেছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় করাচিতে রচিত ও কলকাতার বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বেশ কিছু সংখ্যক গল্প ও উপন্যাস থেকে। ব্যথার দান, 'হেনা' 'বাদল-বরিষণে', 'ঘুমের ঘোরে', 'অতৃপ্ত কামনা', 'রাজবন্দীর চিঠি', 'রিক্তের বেদন', 'মেহের নেগার', 'সাঁঝের তারা' গল্প এবং পত্রোপন্যাস 'বাঁধনহারা'তে প্রায় বিশ পঁচিশটি রবীন্দ্রসঙ্গীত বা কবিতার উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন – 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা', 'আমার সকল দুখের প্রদীপ', 'এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে', 'এমন দিনে তারে বলা যায়', 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে', 'ওহে সুন্দর মরি মরি', 'অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে', 'ওগো দেখি আঁখি তুলে চাও', 'আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই', 'ঝরঝর ঝরিছে বারিধারা', 'তুমি জান ওগো অন্তর্যামী', 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে', 'দুর্জনে দেখা হল', 'ওগো কাঙাল', 'কান্না হাসির দোল দোলানো', 'অশ্রু নদীর সুদূর পারে', 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে', 'হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে', 'মনে রয়ে গেল মনের কথা', 'আরো আঘাত সইবে আমার', 'সখি, প্রতিদিন হায়' প্রভৃতি। বর্তমান শতকের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রচলন ছিল সীমাবদ্ধ। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার, ব্রাহ্মসমাজ, শান্তিনিকেতনের বাইরে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রচার ছিল নিয়ন্ত্রিত। অথচ বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক গ্রামের দরিদ্র মুসলমান পরিবারের সন্তান নজরুল বিশ একুশ বছর বয়সে তাঁর কথাসাহিত্যে যে ভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গীত ব্যবহার করেছেন তা থেকে এক পরিশীলিত, পরিমার্জিত, আধুনিক রুচির তরুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯২০ সালের মার্চ মাসে '৪৯ নং বেঙ্গলি রেজিমেন্ট' ভেঙে দেওয়া হলে নজরুল কলকাতায় এসে ৩২, কলেজ স্ট্রিটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ওঠেন। মুজফ্‌ফর আহমদের ভাষায়, তখন নজরুলের সম্পত্তির মধ্যে অন্যান্য জিনিষ ছাড়া ছিল 'কবিতার খাতা, গল্পের খাতা, পুথি-পুস্তক, মাসিক পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি ইত্যাদি। মুজফ্‌ফর আহমদ নজরুলের কলকাতা জীবনের সূচনা পর্ব সম্পর্কে তাঁর 'নজরুল স্মৃতিকথা'য় আরও লিখেছেন, "এসব সত্ত্বেও সে মূলত গাইত রবীন্দ্রনাথের গান। এত বেশি রবীন্দ্র-সঙ্গীত সে কি করে মুখস্থ করেছিল তা ভেবে আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম। ... আমরা বলতাম নজরুল ইসলাম রবীন্দ্র-সঙ্গীতের হাফিজ।" ১৯২১ সালের শরৎকালের দিকে নজরুলকে শান্তিনিকেতন নিয়ে গিয়েছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ; শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের সাক্ষাৎকারের স্মৃতিচারণ করেছেন রবীন্দ্রনাথের তখনকার একান্ত সচিব কবি সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর ভাই নিশিকান্ত রায়চৌধুরী 'আমার কৈশোর স্মৃতিতে নজরুল' (শান্তিনিকেতনে নজরুল) প্রবন্ধে –

> আমি তখন শান্তিনিকেতনের বালক-ছাত্র। পূজোর ছুটি শেষ হয়ে গেছে। শান্তিনিকেতনের আশ্রমে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা সবাই এসে পড়েছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বাইরে ঘুরে ফিরে এসেছেন। আশ্রম বেশ জমে উঠেছে।
>
> ...
>
> সবে শিশুবিভাগ থেকে নতুন গুরুপল্লীতে দাদা সুধাকান্তের বাড়িতে এসেছি। ... এই সময় একদিন আমাদের বাড়িতে দাদা তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের বলছেন শুনলাম – হাবিলদার কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজ সন্ধ্যায় গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। সুধাকান্তের ওপরই ভার পড়ল তাঁকে ষ্টেশন থেকে নিয়ে আসবার, অতিথি ভবনে তাঁর বাসস্থানের ব্যবস্থা করবার ও কবিগুরুর সঙ্গে তাঁকে দেখা করিয়ে দেবার। ...কলাভবনের দোতলায় সান্ধ্য আসর বসবে, সচকিত মন নিয়ে দাদার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হ'লাম। দেখলাম, কবিগুরু বসে আছেন মাঝখানে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীবৃন্দ সকলেই সমবেত হয়েছেন। কবিগুরুর পাশে দু'জন আগন্তুক সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তাঁদের একজনকে অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখিয়ে দিয়ে দাদা সুধাকান্ত আমাকে বললেন—ঐ দেখ কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এই কথা বলে দাদা গিয়ে নজরুলের সান্নিধ্যেই বসলেন। নজরুলের পাশেই ফেজ-পরা কাঁচা-পাকা দাড়ি নিয়ে একজন বসে

আছেন, কবিগুরুর সঙ্গে মাঝে মাঝে আলাপ করছেন। নজরুলও সেই আলাপে যোগ দিচ্ছেন, কিন্তু তাঁর নামটি আজ আর সঠিক মনে করতে পারছি না, তখন নজরুলই আমার সমস্ত আকর্ষণের উপলক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। তবু যতদূর মনে হয়, তিনি হয়তো ডাঃ শহিদুল্লা সাহেব হবেন। তিনি কবিগুরুকে বলছিলেন - ট্রেনে আসতে আসতে কাজী সাহেব আপনার গীতাঞ্জলির সব ক'টা গান আমাকে গেয়ে গেয়ে শুনিয়েছেন। কবিগুরু বললেন—তাই নাকি? অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি তো। আমার গীতাঞ্জলির গান সব তো আমারই মনে থাকে না। কাজী সাহেব বললেন—গুরুদেব আমি আপনার কণ্ঠে আপনার একটি গান ও একটি কবিতার আবৃত্তি শুনতে চাই। শুনে কবিগুরু বললেন— সে কি? আমি যে তোমার গান ও আবৃত্তি শোনবার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছি, তাড়াতাড়ি শুরু করে দাও, আমাকে আবার রাত্রিবেলায় লেখায় ব্যাপৃত হতে হবে। নজরুল দ্বিরুক্তি না করে আবৃত্তি শুরু করলেন। পুজোর ছুটির পরের ঘটনা। সেজন্যে মনে পড়ে, একটি পুজোর কবিতা তিনি আবৃত্তি করেছিলেন, পরে জেনেছিলাম-সেটি 'অগ্নিবীণা'র 'আগমনী' কবিতাটি। ... একটা অন্তর-স্পর্শী ভাব-ব্যঞ্জনা নিয়ে কবিতাটির আবৃত্তি শেষ হল। নজরুলের একটি সপ্রতিভ ভাব আমার কিশোর মনকে গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর চোখ-মুখের দীপ্তি ও অনায়াস আয়ত্ত ভাবোচ্ছ্বাস একটা প্রাণোচ্ছলতার প্রতিমূর্তি হয়ে দেখা দিল। গান বা আবৃত্তির অনুরোধ এলে একটা সঙ্কোচ প্রকাশের রীতিই সচরাচর চোখে পড়ত। কিন্তু নজরুলের এই বিনা দ্বিধায় বা দ্বিরুক্তিতে আত্মপ্রকাশের স্বচ্ছন্দ প্রাণময়তা আমার সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে যেন ছবি হয়ে উঠল। আজও বলতে পারি - সে আবৃত্তি পৌরুষ-ব্যঞ্জক, কণ্ঠস্বর গম্ভীর, তা স্মরণ করতে গিয়ে আজও আমার অন্তঃশ্রুতিতে নজরুলের সেই ধ্বনি যেন প্রতিধ্বনি তুলছে। বলাই বাহুল্য, কবিগুরুর আবৃত্তির যে স্বাদটির সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম, এর স্বাদ তা থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন-এই অভিনবত্বের আস্বাদটিই তখন আমাকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করেছিল। আবৃত্তির পরে কবিগুরু তাঁকে গান গাইবার আহবান জানালেন। এবার তাঁর কণ্ঠে একটি বিষাদঘন করুণ সুর বেজে উঠল। গানটি পুত্র বিয়োগ-ব্যথায় বিধুর।

কোন্ সুদূরের চেনা বাঁশির ডাক শুনেছিস্ ওরে চখা
ওরে আমার পলাতক।

এই গানের সুরেও একটি নতুনত্ব সুস্পষ্ট দেখলাম। তাই খুবই ভাল লেগেছিল এবং আবেশে আপ্লুত হয়েছিলাম। ... গানটি শুনে কবিগুরু বলে উঠলেন–বাঃ বেশ! এটি কবে লিখলে? ফেজপরা ভদ্রলোকটি বললেন – সম্প্রতি কাজী সাহেব তাঁর একটি শিশুপুত্রকে হারিয়ে এই শোক–গাথাটি রচনা করে সান্ত্বনা খুঁজে ফিরছেন। কবিগুরু কিছুক্ষণ নীরব থেকে যেন সমবেদনা প্রকাশ করলেন।

কিছু পরে কবিগুরু বললেন – তোমরা কি কালই সকালে চলে যাবে? দু'একদিন থাকতে পার না? শুনে ভদ্রলোকটি বলনে—থাকতে পারলে খুবই ভাল হত, কিন্তু কাজী সাহেবের যে নানা কাজের পূর্ব-ব্যবস্থা স্থির আছে। কাজী সাহেব বলে উঠলেন –গুরুদেব, এবার আপনার একটি আবৃত্তি ও একটি গান আমরা শোনার জন্যে একান্ত উৎসুক। কবিগুরু জানালেন – গান এখন আর গাইতে পারি না, সুর ভুলে যাই। আমার একটি সম্প্রতি লেখা গান, কবিতায় আবৃত্তি করি। তোমরা যেমন হঠাৎ এসেই চলে যেতে চাচ্ছ, আমার গানের মাধবীও তেমনি হঠাৎ এসেই চলে যেতে চায়। কবিগুরুর সুললিত ও রমণীয় কণ্ঠে বেজে উঠল :

মাধবী হঠাৎ কোথা হতে
এল ফাগুন দিনের স্রোতে
এসে হেসেই বলে, 'যাই যাই যাই'। ...

কবিগুরু যতক্ষণ আবৃত্তি করছিলেন, ততক্ষণ কবি নজরুলের কালো বাবরি চুলের মাথাটি আবৃত্তির তালে তালে দুলছিল এবং তাঁর মুখ–চোখ একটা আবেশমুগ্ধ অভিব্যক্তি প্রকাশ করছিল। আবৃত্তি শেষ করে কবিগুরু দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং সমবেত সকলেই দাঁড়িয়ে উঠলেন। বিদায়ের একটি অনুচ্চারিত বেদনার সুর বেজে উঠল।

১৯২০ সালের মার্চ মাসের পরে নজরুলের কলকাতার সাংবাদিক–সাহিত্যিক জীবনের শুরুর – সময় কলকাতায় সাহিত্যিকদের দুটি বিখ্যাত আড্ডা ছিল। একটি 'ভারতী' কার্যালয়ে 'ভারতীর আড্ডা' ; এখানে আসতেন, অতুলপ্রসাদ সেন, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির ভাদুড়ী, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ। অপর আড্ডাটি ছিল 'গজেনদার আড্ডা' ; এখানে আসতেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ওস্তাদ

করমতুল্লাহ খাঁ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, ধূর্জটিপ্রসাদ প্রভৃতি। এ দুটি আড্ডাতেই নজরুলের যাতায়াত ছিল। সেসব আসরে নজরুলের চিত্র এঁকেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়,

> ... নজরুল আসতে লাগলেন প্রত্যহ এবং দু'দিন না যেতেই বোঝা গেল ছেলেটি লাজুক নয় আদৌ ...ঝড়ের মত ঘরে ঢুকেই সবাইকে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, "দে গুরুর গা ধুইয়ে", কোন দিকে দৃকপাত না করে প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ করেন টেবিল হারমোনিয়ামটাকে, তারপর মাথার ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে গাইতে থাকেন গানের পর গান। ... কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ওপরে ঘর, রাস্তায় জমে যেত জনতা। অনেক বড় বড় গায়ক সে ঘরে এসে গান গেয়েছেন, তবু তাঁদের গান শোনার জন্য অত লোক দাঁড়িয়ে যেত না! কিন্তু নজরুলের গানের ভিতর নিশ্চয়ই ছিল কোন বিশেষ আকর্ষণীয় শক্তি।... ('যাঁদের দেখেছি' দ্বিতীয় পর্ব, নিউ'–এজ পাবলিশার্স, কলিকাতা ১৩৫৯)

৩৮ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বাড়ির ঐ সাহিত্যিক আসরে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় ঘটে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় দুই কবির প্রথম দেখা হওয়ার কাহিনী বর্ণনা করেছেন, 'চলমান জীবন' দ্বিতীয় পর্ব গ্রন্থে,

> গজেনদা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসে গল্প করছেন। সত্যেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন, "কই পবিত্র তোমার শাতিল আরব–এর কবি কোথায়! আমি নিয়মিত 'মোসলেম–ভারত' পড়ি, ওরা ভালবেসে কাগজ পাঠান বলে নয়, কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাগুলো আমায় টানে। কি অনবদ্য মিল ও ছন্দ, অথচ কত আরবী পারশি শব্দ নিয়ে সে ছন্দ মিলকে গাঁথতে হয়েছে।" ... সন্ধ্যের সময় নজরুলকে গিয়ে বললাম কবি সত্যেন দত্ত তোর সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছেন..লক্ষ্মী ছেলের মত এগিয়ে এল কাজী। বললাম, এই কবি সত্যেন দত্ত ... নজরুলের চোখ মুখ উচ্ছ্বসিত, সত্যেনদা জড়িয়ে ধরেন কাজীকে, বলেন, 'তুমি ভাই, নতুন ঢেউ এনেছ। আমরা ত নগণ্য, গুরুদেবকে পর্যন্ত বিস্মিত করেছ তুমি।' 'গুরুদেব আমার কোন লেখা পড়েছেন নাকি।' বিহ্বল হয়ে প্রশ্ন করে কাজী।
>
> 'সত্যি বলতে কি', বললেন, সত্যেনদা, 'গুরুদেবই আমাকে একদিন নিজে থেকে প্রশ্ন করলেন, কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা পড়েছ কি না। তাঁর মতে ভাবের সংস্কৃতি সমন্বয়ের সাধনার এই এক নতুন অবদান আনছ তুমি।'

'গুরুদেব বলেছেন'। আনন্দের আতিশয্যে মুখের কথা শেষ করতে পারেনা নজরুল।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বর্ণিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কথিত রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বুঝতে পেরেছিলেন, "ভাবের সংস্কৃতি সমন্বয়ের সাধনায় এই এক নতুন অবদান।" রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম কখন দেখা, শান্তি নিকেতনে না জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে? ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মে মাস থেকে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাস পর্যন্ত প্রায় চৌদ্দ মাস রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে ছিলেন। ইউরোপ থেকে ফিরে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই-আগস্ট মাসের দিকে রবীন্দ্রনাথ কিছু দিন কলকাতায় অতিবাহিত করেন। ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের দেখা হওয়া সম্ভবপর। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণনা থেকে মনে হয়, কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের দেখা হয়,

> জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসার সময় তেমন বড় লোককেও সমীহ করে যেতে দেখেছি, অতি বাকপটুকেও ঢোঁক গিলে কথা বলতে শুনেছি, কিন্তু নজরুলের প্রথম ঠাকুর বাড়ীতে আবির্ভাব সে যেন ঝড়ের মত। অনেকে বলত, তোর এ সব দাপাদাপি চলবেনা জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে, সাহসই হবেনা তোর এমনি ভাবে কথা কইতে। নজরুল প্রমাণ করে দিলে যে সে তা পারে। তাই একদিন সকাল বেলা 'দে গরুর গা ধুইয়ে' এই রব তুলতে তুলতে সে কবির ঘরে গিয়ে উঠল, কিন্তু তাকে জানতেন বলে কবি বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট হলেন না। (সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, 'আমাদের নজরুল')

১৯২২ সালের ১১ জুলাই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রয়াণে রামমোহন লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে যে শোকসভা হয়েছিল নজরুলও তাতে যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ স্মরণসভায় নজরুলকে ডেকে পাশে বসিয়েছিলেন, 'নজরুল সদ্যরচিত 'সত্যকবি' কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন। সভাশেষে উভয় কবির মধ্যে মৃদুকণ্ঠে কিছু আলাপ-আলোচনা হয়েছিল।

রবীন্দ্র-নজরুল সম্পর্ক পরবর্তীতে বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে কিন্তু এই দুই কবির শ্রদ্ধা ও স্নেহের মৌলিক সম্পর্ক কখনও বিচলিত হয়নি।

নজরুলের অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ১১ আগস্ট, ১৩২৯ সালের ২৪ শ্রাবণ শুক্রবার। ক্রাউন ফলিতে ১৫×১০ সাইজের আট

পৃষ্ঠা পত্রিকা, মূল্য এক আনা, বার্ষিক চাঁদা পাঁচ টাকা। চার সংখ্যার পরে পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে হয় বারো। 'ধূমকেতু'র ম্যানেজার ছিলেন শান্তিপদ সিংহ, 'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যা থেকে প্রতিটি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত আশীর্বাণীটি ছাপা হয়, প্রথম ছয়টি সংখ্যায় ১ম পৃষ্ঠায় ৭ম সংখ্যা থেকে ৩য় পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় স্তম্ভের ওপরে, রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপিতে

কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু,
আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে'
আছে যারা অর্ধচেতন !

২৪শে শ্রাবণ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১৩২৯

আশীর্বাণীর তারিখ থেকে বোঝা যায় যে, পত্রিকা প্রকাশের পূর্বেই তা রবীন্দ্রনাথের কাছে চাওয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আশীর্বাণী পাওয়ার কাহিনী প্রকাশ করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় আর তা বর্ণনা করেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোল যুগ' (ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৬৬)গ্রন্থে,

> ... তবু নজরুল শেষ মুহূর্তে তাঁকে টেলিগ্রাম করে দিল। রবীন্দ্রনাথ কবে কাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তা ছাড়া, এ নজরুল যার কবিতায় পেয়েছেন তিনি তপ্ত প্রাণের নতুন সজীবতা। শুধু নামে আর টেলিগ্রামেই তিনি বুঝতে পারলেন 'ধূমকেতু'র মর্মকথা কি !...
>
> 'ধূমকেতু'কে তিনি যা লিখে পাঠালেন তা স্পষ্ট রাজনীতি প্রত্যক্ষ গণজাগরণের সংকেত।

'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রকাশ উপলক্ষে শরৎচন্দ্রের কাছ থেকেও বাণী পাওয়া গিয়েছিল সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে একই সময়ে বাণী পাওয়া

গিয়েছিল। আর তাঁরা একই তারিখে বাণী পাঠিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের বাণী ,

২৪ শে শ্রাবণ

কল্যাণীয়েষু, শিবপুর

তোমাদের কাগজের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া তোমাকে একটি মাত্র আশীর্বাদ করি, যেন শত্রু–মিত্র নির্বিশেষে নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতে পার। তারপর ভগবান তোমার কাগজের ভার আপনি বহন করিবেন।

তোমাদের

শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(শরৎচন্দ্রের বাণীটি 'ধূমকেতু' পত্রিকার ২৭ জানুয়ারি, ১৯২৩ সংখ্যায় ছাপা হয়)

'ধূমকেতু' পত্রিকার ১২শ সংখ্যায় (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২২) প্রকাশিত নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামক একটি প্রতীকধর্মী রাজনৈতিক কবিতা প্রকাশের পর নজরুলকে 'গ্রেফতার এবং রাজদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ নভেম্বর চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর আদালতে নজরুলকে হাজির এবং ২৯ নভেম্বর শুনানির দিন ধার্য হয়। নজরুলের পক্ষ সমর্থনে বেশ কয়েকজন আইনজীবী বিনা পারিশ্রমিকে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন মলিন মুখোপাধ্যায় আদালতে নজরুলের পক্ষ সমর্থন করেন। একই মামলার আসামি এবং জামিনে মুক্ত নজরুলের বন্ধু, 'ধূমকেতু'র মুদ্রাকর ও প্রকাশক আফজালুল হক এ মামলায় নজরুলের বিপক্ষে সরকারি 'এপ্রুভার' হয়ে সাক্ষী দেন। বিচারের সময় নজরুল আত্মপক্ষ সমর্থন করে আদালতে যে বিবৃতি দেন, তা বাংলা সাহিত্যে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে পরিচিত।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহো মামলার রায় দেন। ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২৪-ক এবং ১৫৩-ক ধারা অনুযায়ী 'ধূমকেতু' রাজদ্রোহ মামলায় নজরুল এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

বিচারাধীন বন্দী হিসেবে নজরুল এতদিন ছিলেন প্রেসিডেন্সি জেলে, বিচার শেষে ১৭ জানুয়ারি নজরুলকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তর করা হয়।

নজরুল কারাবরণ করে সমগ্র দেশবাসীর যে শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাট্যটি নজরুলকে উৎসর্গ করে সেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। নজরুল

তখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী ; রবীন্দ্রনাথ সে সময় ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি 'বসন্ত' নজরুলকে উৎসর্গ করেন। তিনি উৎসর্গ পত্রে লিখেছিলেন,

উৎসর্গ

শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু

১০ই ফাল্গুন ১৩২৯

'বসন্ত' নজরুলকে আলিপুর জেলে পৌঁছে দেবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে জোড়াসাঁকোয় ডেকে পাঠান। রবীন্দ্রনাথ সেখানে ভক্তজন পরিবৃত হয়ে বসেছিলেন। পবিত্রবাবুকে তিনি বললেন, "জাতির জীবনের বসন্ত এনেছে নজরুল। তাই আমার সদ্য প্রকাশিত 'বসন্ত' গীতিনাট্যখানি ওকেই উৎসর্গ করেছি। সেখানা নিজের হাতে তাকে দিতে পারলে আমি খুশি হতাম, কিন্তু আমি যখন নিজে গিয়ে দিয়ে আসতে পারছি না, ভেবে দেখলাম, তোমার হাত দিয়ে পাঠানোই সবচেয়ে ভালো, আমার হয়েই তুমি বইখানা ওকে দিও।" রবীন্দ্রনাথের উপস্থিত ভক্তরা সবাই খুশি হতে পারেননি এই উৎসর্গে ; এটি সম্ভবত ঠাকুর পরিবারের বা ব্রাহ্ম সমাজের বাইরে কাউকে রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থের প্রথম উৎসর্গ। রবীন্দ্রনাথ তা বুঝতে পেরে এই আসরে অমল হোমের নেতৃত্বে ভিন্ন মতাবলম্বীদের সঙ্গে যে বাক্য বিনিময় করেছিলেন তা জানা যায় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের জবানি থেকে :

> নজরুলকে আমি 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছি এবং উৎসর্গ পত্রে তাকে 'কবি' বলে অভিহিত করেছি। জানি তোমাদের মধ্যে কেউ এটা অনুমোদন করতে পারনি। আমার বিশ্বাস, তোমরা নজরুলের কবিতা না পড়েই এই মনোভাব পোষণ করেছ। আর পড়ে থাকলেও তার মধ্যে রূপ ও রসের সন্ধান করনি, অবজ্ঞাভরে চোখ বুলিয়েছ মাত্র।
>
> মার মার কাট কাট ও অসির ঝনঝনার মধ্যে রূপ ও রসের প্রলেপটুকু হারিয়ে গেছে, উপস্থিত একজন মন্তব্য করলেন।
>
> কাব্যে অসির ঝনঝনা থাকতে পারেনা, এও তোমাদের আবদার বটে। সমগ্র জাতির অন্তর যখন সে সুরে, বাঁধা, অসির ঝনঝনায় যখন সেখানে ঝংকার তোলে, ঐকতান সৃষ্টি হয়, তখন কাব্যে তাকে প্রকাশ করবে বৈ কি? আমি যদি আজ তরুণ হতাম, তাহলে আমার কলমেও ওই সুর বাজত। কিন্তু তার রূপ হত ভিন্ন, আর একজনের মন্তব্য শোনা গেল।

দু-জনের প্রকাশ তো দু'রকম হবেই কিন্তু তা বলে আমারটা নজরুলের চেয়ে ভাল হত, এমন কথাই বা জোর করে বলবে কি করে :

যাই বলুন, ও অসির ঝনঝনা জাতির মনে আবেগ ভাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নজরুলী কাব্যের জনপ্রিয়তাও মিলিয়ে যাবে,

মন্তব্য এল ফরাস থেকে।

জনপ্রিয়তা কাব্য বিচারের স্থায়ী নিরিখ নয়, কিন্তু যুগের মনকে যা প্রতিফলিত করে, তা শুধু কাব্য নয়, মহাকাব্য।

('কবি স্বীকৃতি' 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা' ঢাকা ১৩৭৬)

রবীন্দ্রনাথ 'বসন্ত' কাব্যের একটি কপিতে নিজের নাম দস্তখত করে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, "তাকে বলো, আমি নিজের হাতে তাকে দিতে পারলাম না বলে সে যেন দুঃখ না করে। আমি তাকে সমগ্র অন্তর দিয়ে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ জানাচ্ছি। আর বলো, কবিতা লেখা যেন কোন কারণেই সে বন্ধ না করে। সৈনিক অনেক মিলবে কিন্তু যুদ্ধে প্রেরণা জাগাবার কবিও তো চাই।" সেদিন জেলখানায় ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার বিস্মিত হয়েছিলেন 'টেগোর ঐ প্রিজনারকে বই ডেডিকেট করেছেন' শুনে, আর নজরুল 'বসন্ত' খানা তুলে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বুকে চেপে ধরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ঐ উৎসর্গ নজরুলের জেল জীবনের বেদনার অনেকটা উপশম করতে পেরেছিল। নজরুল এ সম্পর্কে লিখেছেন, "এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটক আমায় উৎসর্গ করেন। তাঁর এই আশীর্বাদ-মালা পেয়ে আমি জেলের সর্বজ্বালা, যন্ত্রণা ক্লেশ ভুলে যাই।' নজরুল আরো লিখেছেন,

হে সুন্দর. বহ্নি দগ্ধ
মোর বুকে তাই
দিয়ে 'ছিলে', 'বসন্তের'
পুষ্পিত মালিকা।

কিন্তু কেউ কেউ নজরুলকে ব্যঙ্গ করে রচনা করেছিলেন,

বসন্ত দিল রবি
তাইতো হয়েছে কবি।

কি কারণে জানা যায় না, হয়তো অতি ভক্তদের তৎপরতায় 'বসন্ত' নাটিকায় দ্বিতীয় সংস্করণে উৎসর্গ পত্রটি ছিল না, পরের সংস্করণগুলোতে এবং 'রবীন্দ্ররচনাবলী'তে অবশ্য উৎসর্গ পত্রটি রয়েছে। নজরুল আলিপুর জেলে তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' রচনা করেন, রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' নাটিকার উৎসর্গ এ কবিতা রচনায় প্রেরণা যোগাতে পারে।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল নজরুলকে হুগলি জেলে স্থানান্তর করা হয় :

হুগলি জেলের সুপার মি. আর্সটান রাজবন্দীদের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করতেন এবং নিত্য নতুন অত্যাচার চালাতেন ; ফলে, বন্দীরাও জেল-জুলুমের প্রতিবাদে জেলে আইন ভঙ্গ করতে বাধ্য হন। নজরুল এই জেল সুপারকে নিয়েই রবীন্দ্রনাথের 'তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে' গানটির সুরে 'সুপার (জেলের) বর্ণনা' প্যারডি গান বেঁধেছিলেন, 'তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে তুমি ধন্য ধন্য হে'। গানটির পাদটীকায় লেখা ছিল, 'হুগলি জেলে কারারুদ্ধ থাকাকালীন জেলের সকল প্রকার জুলুম আমাদের ওপর দিয়ে পরখ করে নেওয়া হয়েছিল, সেই সময় জেলের মূর্তিমান 'জুলুম' বড়কর্তাকে দেখে এই গান গেয়ে আমরা অভিনন্দন জানাতাম।' হুগলি জেলে নজরুল 'সেবক' কবিতা রচনা করেছিলেন, যার প্রথম অংশ,

সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যচারীর খাঁড়ায়,
নেই কিরে কেউ সত্য সাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায়,—
শিকলগুলো বিকল করে পায়ের তলে মাড়ায়,—
বজ্র-হাতে, জিন্দানের ঐ ভিত্তিটাকে নাড়ায়। ('বিষের বাঁশী')

নজরুলের বিখ্যাত 'শিকল পরার গান'ও হুগলি জেলে রচিত যার প্রথমাংশ হলো—

এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল!
তোদের বদ্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার ভাঁধন-ভয়। ('বিষের বাঁশী')

হুগলি জেলের চিত্র পাওয়া যায় খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীনের বর্ণনা থেকে। হুগলি জেলে রাজবন্দীরা সুপার ও তার সহযোগী অফিসারদের সাধারণ কয়েদিদের মতো

'সরকার-সালাম' জানাতে অস্বীকার করে। ফলে, শাস্তি স্বরূপ তাদের ভাতের বদলে দেওয়া হয় মাড়ভাত, পায়ে 'ডাণ্ডা-বেড়ী'। 'সরকার-সালামে'র বদলে রাজবন্দীরা নজরুলের নেতৃত্বে গান ধরেন 'তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে তুমি ধন্য ধন্য হে'। সুপার ক্রদ্ধ.হয়ে কবিকে উন্মাদের মতো চীৎকার করে বলে 'ইউ ড্যাম ফুল সোয়াইন', কবিও একই কথাগুলো তাক ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে রাজবন্দীদের নির্জন সেলে আটক করা হয়। রাজবন্দীদের ওপর এই সব অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল থেকে হুগলি জেলে নজরুল অনশন ধর্মঘট করেন। নজরুলের অনশনের খবর জেলের বাইরে ছড়িয়ে পড়লে দেশব্যাপী উদ্বেগ ও উত্তেজনা দেখা দেয় ; জেলের ভেতরে সহবন্দীদের অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে কবি দিনের পর দিন অনশন চালিয়ে যেতে থাকেন।

নজরুলের অনশনের সংবাদে কলকাতা থেকে নজরুলের সাহিত্যিক বন্ধুদের কেউ কেউ হুগলি জেলে গিয়ে নজরুলের সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সাক্ষাতের অনুমতি মেলেনি। তবে, আবদুল হালিমের নামে দেওয়া নজরুলের গোপন চিঠি থেকে তাঁরা জেলের সমস্ত ঘটনা জানতে পারেন। জেলের ভেতরে অনশনরত নজরুলের ওপর উৎপীড়ন বেড়ে যেতে থাকে, ডাণ্ডাবেড়ি, হ্যাণ্ডক্যাপ, সেল কয়েদ, ফোর্সড ফিডিং-এর চেষ্টা সব চলতে থাকে ; ফলে, নজরুল ক্রমশ অধিক দুর্বল হয়ে পড়েন। জেলের বাইরে উদ্বেগ বাড়তে থাকে ; নজরুলের বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং নলিনীকান্ত সরকার নজরুলকে অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধ জানানোর জন্যে জেল গেটে দেখা করতে বিফল হন। তখন নলিনীকান্ত সরকার পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাঁধে চড়ে জেলের পাঁচিলে উঠে যান, যেখান থেকে জেল প্রাঙ্গণে নজরুলকে হাত জোড় করে অনুরোধ জানান খাওয়ার জন্যে, নজরুল ইঙ্গিতে জানান তা সম্ভব নয়।

হুগলি জেলে অনশনরত নজরুল এবং সহবন্দীদের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়, ঐ সময়কার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত সংবাদ থেকে। এ প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'রাজবন্দী কবি' শীর্ষক প্রবন্ধ (২৯ মে ১৯২৮)। শেখ দরবার আলম আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ২৮.৪.২৩ তারিখে 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' সংবাদ প্রকাশিত হয় :

> ২১ জন বন্দীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার মধ্যে তিনজনের অবস্থা অত্যন্ত আশংকাজনক। ... কাজী নজরুল, মৌলবী সিরাজউদ্দীন এবং

> গোপালবাবু যথাক্রমে ১৪, ১২ এবং ১৩ দিন যাবত সম্পূর্ণ অনাহারে আছেন। কাজী নজরুলের রাত্রিতে ভয়ানক জ্বর হয় এবং মাথায় রক্ত উঠিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। জ্বরের সময় তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকেন।...

'আনন্দবাজার পত্রিকায়' অনশনরত নজরুলের অবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে ১৫ মে ১৯২৩, সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> কাজী নজরুল ইসলাম, মৌলবী সিরাজউদ্দীন এবং বাবু গোপালচন্দ্র সেন প্রায় এক মাস পূর্বে হুগলী জেলের মধ্যে প্রায়োপবেশন করিতেছেন এবং অদ্যাপি সেই অবস্থায় আছেন। ... কয়েকদিন পর গোপাল বাবুকে নাকের ভিতর দিয়া খাওয়ানো হয়েছিল, কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম কোন খাদ্যই গ্রহণ করেন নাই। ৫ই মে পর্যন্ত তাঁহাকে জোর করিয়া খাওয়ানো হয় নাই। ২৪ শে এপ্রিল হইতে কাজী সাহেবের জ্বর হইতে আরম্ভ করে। এই জ্বর অবস্থায় এতদিন অনাহারে থাকিয়া তাঁহার শরীরের ওজন প্রায় ১৩ সের কমিয়া গিয়াছে। বর্তমানে তাঁহার অবস্থা এতদূর খারাপ যে, যে কোন মুহূর্তে কোনরূপ দুঃসংবাদ আসিতে পারে।

ঐ পত্রিকাতে ২৩শে মে পুনরায় সম্পাদকীয়তে উদ্বেগ প্রকাশ করে লেখা হয়,

> আজ ৪০ দিন হইল অনশনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। অনশনের পঞ্চম দিনে নাকের ভিতর দিয়া জোর করিয়া খাদ্য দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ফলে তাঁহার নাক দিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। তারপর হইতে কাজী নজরুল প্রায় অনশনেই আছেন। মাঝে সামান্য একটু দুধ তাঁহাকে জোর করিয়া খাওয়ানো হইতেছিল। যে কোন মুহূর্তে চরম দুসংবাদ আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিতে পারে।

ঐ পরিস্থিতিতে কলকাতা থেকে শিলং-এ রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখা হয় তিনি যেন নজরুলকে অনশন ভঙ্গ করতে অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেন, রবীন্দ্রনাথ উত্তরে জানান, "আদর্শবাদীকে আদর্শ ত্যাগ করতে বলা তাকে হত্যা করারই সামিল। অনশনে যদি কাজীর মৃত্যু ঘটে তা হলেও তার অন্তরে সত্য আদর্শ চিরদিন মহিমাময় হয়ে থাকবে।" কিন্তু ও কথা লিখলেও নজরুলের অনশনে বিচলিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে ঠিকই টেলিগ্রাম করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন,

নজরুল ইসলামকে প্রেসিডেন্সী জেলের ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলুম, লিখেছিলুম,

Give up hunger strike, our literature claims you, জেল থেকে memo এসেছে the addressee not found অর্থাৎ ওরা আমার বার্তা ওকে দিতে চায় না, কেননা নজরুল প্রেসিডেন্সী জেলে না থাকলেও ওরা নিশ্চয় জানে সে কোথায় আছে। অতএব নজরুলের আত্মহত্যায় ওরা বাধা দিতে চায় না।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নজরুলের জন্মোৎসব কমিটির সম্পাদকের লেখা পত্র', 'নজরুল পরিক্রমা')।

শরৎচন্দ্রও নজরুলের অনশনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন, তিনি বাজে শিবপুর থেকে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে হুগলি জেলখানায় গিয়ে নজরুলের সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করেন, উদ্দেশ্য ছিল নজরুলকে অনুরোধ জানিয়ে অনশন ভঙ্গ করানো ; কিন্তু শরৎচন্দ্র দেখা করতে পারেননি। চুরুলিয়া থেকে নজরুলের মা আসেন হুগলি জেল গেটে কিন্তু নজরুলের সঙ্গে দেখা হয় নি। শেষ পর্যন্ত অনশনের চল্লিশতম দিবসে বিরজাসুন্দরী দেবীর হাতে লেবুর রস পান করে কবি অনশন ভঙ্গ করেন।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার বিতর্ক ও খুনের মামলা

১৩৩৩ সালে 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় নজরুল সমালোচনার এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। এবারে নজরুলের সঙ্গে সঙ্গে 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' পত্রিকার আধুনিক সাহিত্যিকরাও 'শনিবারের চিঠি'র লক্ষ্য হন। ১৩৩৩ সালের আষাঢ় থেকে ১৩৩৪ সালের কার্তিক পর্যন্ত 'শনিবারের চিঠি'র বিভিন্ন সংখ্যায় নজরুলের বিভিন্ন রচনা ব্যঙ্গ করে অনেকগুলি প্যারডি ছাপা হয়েছিল। 'শনিবারের চিঠি' নব পর্যায়ে মাসিক আকারে বের হতে থাকে ১৩৩৪ সালের ভাদ্র থেকে, এবারেও প্রধান লক্ষ্য কাজী নজরুল ইসলাম। ভাদ্র সংখ্যায় নজরুলকে 'বাংলার আধুনিক বরপুত্র নবযুগ ধুরন্ধর সাহিত্য সারথি' আখ্যা দিয়ে তাঁর 'অনামিকা' কবিতার একটি প্যারডি ছাপা হয় 'বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ' নামে, রচয়িতা গাজী আব্বাস বিটকেল।

পরে সজনীকান্ত দাসকে নজরুলের 'অনামিকা', 'মাধবী প্রলাপ', 'গোপন প্রিয়া'

কবিতা সম্পর্কে অশ্লীলতার প্রশ্ন তুলে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ছুটোছুটি করতে দেখা যায়, তারই ভূমিকা এই প্যারডি।

মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র ১ম সংখ্যায় মধুকর কাঞ্জিলাল রচিত, 'তোমাদের প্রতি' নামে যে কবিতাটি ছাপা হয়, সেটিও নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাকে ব্যঙ্গ করে লেখা।

'শনিবারের চিঠি'র এসব ব্যঙ্গ রচনার উদ্দেশ্য ছিল নজরুলের চরিত্র হনন, প্রমীলাকে বিয়ে করার পর থেকে যার শুরু। শুধু কবিতায় নয়, ১৩৩৪–এর ভাদ্র থেকে পৌষ পর্যন্ত পাঁচটি সংখ্যার 'গণবাণী'কে ব্যঙ্গ করে 'কচি ও কাঁচা' নামে একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। নাটকের পাত্র-পাত্রীগণ ছিলেন সম্পাদক, কার্ল মার্কস, শেলী, লেলিন, ট্রটস্কি, হুইটম্যান, প্রোলেটারিয়েট বাইরন আর পাত্রীগণ বৌদি, পট্‌লি, খেঁদি, ছেঁড়া নেকড়া, ভাঙ্গা চুড়ী, ছেঁড়া চুল ইত্যাদি। চরিত্রগুলোর প্রকৃত পরিচয়, কার্ল মার্কস – মুজফফর আহমদ, ট্রটস্কি–সৌমেন ঠাকুর, প্রোলেটারিয়েট বাইরন—নজরুল ইসলাম। এ নাটকের সময় খ্রিস্টীয় বিংশ শতাব্দী, স্থান কলিকাতা মহানগরী। নাটকে, ঢেঁকীর গান, 'কুলোর গান', 'চায়ের গান' অর্থাৎ নজরুলের 'কৃষাণের গান', 'শ্রমিকের গান', জেলেদের গান'–এর প্যারডি সংযোজিত হয়েছিল' 'যুগ লক্ষ্মণগুলি' প্রকাশ পাবে বলে। নাটকটির সূচনা 'ঢেঁকি ও কুলোর গান' দিয়ে। মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র আশ্বিন (১৩৩৪) সংখ্যায় নাটকটির দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের পরিচয়লিপিটি ছিল আসলে 'গণবাণী' অফিসের ব্যঙ্গচিত্র,

> হ্যারিসন রোডের উপরে একটি গৃহের দ্বিতলে সাপ্তাহিক বোলশেভিকী কার্যালয়। .. গেরুয়া খদ্দর পরিহিত সৌম্যদর্শন সুশ্রী একটি ছোকরা সেই চাদরের উপর বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে প্রুফ দেখিতেছেন, তাঁহার আকৃতি ও সাজসজ্জার সহিত এই ঘরের কিছুই ভাল খাপ খায়না, ইনি ট্রটস্কি (সৌমেন ঠাকুর)। পশ্চাতের অন্ধকার দরজা দিয়া 'আর পারিনা সাধ্‌তে লো সই' অফোটা এই গাহিতে গাহিতে ঝাঁকড়া চুলওয়ালা ঘাড়ে গর্দানে এই হৃষ্টপুষ্ট কৃষ্ণকায় যুবকের প্রবেশ, ইনি প্রলেটারিয়েট বাইরন (নজরুল)। ইহার পিছনে কার্লমার্কস (মুজাফফর আহমদ), লেনিন প্রভৃতি গণতন্ত্র দরদীদের প্রবেশ। বাইরন সজোরে ট্রটস্কির পিঠে এক থাবা মারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন হুররে থ্রি চিয়ার্স ফর 'বোলশেভিকী'..

নাটকটিতে বাইরনের গলায় যেসব গান দেওয়া হয়েছিল সেগুলো ছিল এরকম,

'চা আমার চা–আমার গামলা ভরা চা। খেত না মোর চাচী হায়রে খেত আমার চাচা' অথবা "হুশিয়ার হুঁশিয়ার আইন কানুন, তন্ত্র, মন্ত্র পুলিশের ঘুষি আর। রুধিয়া রেখেছে, মুক্তির পথ বেলাশেভী হুঁশিয়ার'। 'শনিবারের চিঠি'র পৌষ (১৩৩৪) সংখ্যায় নজরুলের জনপ্রিয় 'কে বিদেশী বন উদাসী' গানের প্যারডি 'কে উদাসী বনগাঁবাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে, বাঁশী সোহাগে ভিরমি লাগে, বর ভুলে যায় বিয়ের কনে' ছাপা হয় এটি নজরুল ও ঢাকা বনগ্রামের রানু সোমকে নিয়ে লেখা এবং প্রকাশিত হয় ফাল্গুন সংখ্যায়। 'জলসা' ব্যঙ্গ গান ও 'ভগবানের বুকে কারা মারে লাথি' ইত্যাদি কবিতা বা গানের প্যারডির অধিকাংশের রচয়িতা সজনীকান্ত দাস।

নজরুলের বিখ্যাত ধূমকেতু কবিতার একটি অংশের সজনীকান্ত দাস কৃত প্যারডি 'অঙ্গুষ্ঠ' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

সজনীকান্ত নজরুলের 'ঝড়' কবিতার প্যারডি করে লিখেছিলেন 'কবিঝড়' যা একই গ্রন্থের অন্তর্গত।

নজরুলের বিখ্যাত গান 'কান্ডারী হুঁশিয়ার'–এর প্যারডি 'ভাণ্ডারী হুঁশিয়ার' আর 'মাধবী প্রলাপ'–এর প্যারডি 'কবির প্রলাপ' রচনা করেন সজনীকান্ত দাস এবং সেগুলো ছাপা হয় 'অঙ্গুষ্ঠ' গ্রন্থে।

সজনীকান্ত দাস 'শনিবারের চিঠি'র মাধ্যমে নজরুলকে ব্যঙ্গ করেই ক্ষান্ত হননি, নতুন সাহিত্যের মুখপত্র 'প্রগতি' 'কল্লোল', 'কালি–কলম', 'উত্তরা', 'ধূপছায়া' এবং 'আত্মশক্তি' পত্রিকাসমূহকে তিনি 'নব–সাহিত্য বন্দনায়' কটাক্ষ করেছিলেন। সজনীকান্ত দাস বিদ্রূপ করেই ক্ষান্ত হননি, আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তিনি রবীন্দ্রনাথকে ১৩৩৩ সালের ২৩ ফাল্গুন একটি পত্র প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল, নতুন সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে বাজিয়ে দেখা। তিনি লিখেছিলেন,

সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ বাংলাদেশে এক ধরনের লেখা চলছে আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন। প্রধানত 'কল্লোল' ও 'কালি–কলম' নামক দু'টি কাগজে এগুলি স্থান পায়। ... যৌনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব অথবা এই ধরনের কিছু নিয়ে এগুলি লিখিত হচ্ছে। .. দৃষ্টান্তস্বরূপ নরেশবাবুর কয়েকখানি বই, 'কল্লোল' প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হল উতলা' নামক একটি গল্প, 'যুবনাশ্ব' লিখিত কয়েকটি গল্প, এই মাসের (ফাল্গুন) 'কল্লোল' প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটি, 'কালি–কলমে' নজরুল

ইসলামের 'মাধবী প্রলাপ' ও 'অনামিকা' নামক দু'টি কবিতা ও অন্যান্য কয়েকটি লেখার উল্লেখ করা যেতে পারে। ... আমরা কতকগুলি বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও নাটকের সাহায্যে শনিবারের চিঠিতে ... এর বিরুদ্ধে লিখেছিলাম। ... কিন্তু এই প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ এত ক্ষীণ যে, কোন প্রবল পক্ষের তরফ থেকে এর প্রতিবাদ বের হওয়ার একান্ত প্রয়োজন আছে। যিনি আজ পঞ্চাশ বছর ধরে বাঙলা সাহিত্যকে রূপে রসে পুষ্ট করে আসছেন তাঁর কাছেই আবেদন করা ছাড়া আমি অন্য পথ না দেখে আপনাকে বিরক্ত করছি। ... (আধুনিক বাংলা সাহিত্য, 'শনিবারের চিঠি', ভাদ্র ১৩৩৪)

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে ২৫শে ফাল্গুন পত্রের উত্তর দিলেও সজনীকান্তের উত্থাপিত প্রসঙ্গ কৌশলে এড়িয়ে যান। অজুহাত দেন কঠিন আঘাতে একটা আঙুল সম্প্রতি পঙ্গু হওয়াতে লেখা সহজে সরচেনা। ফলে বাক সংযম সতঃসিদ্ধ।' তবে তিনি যা লেখেন তা 'শনিবারের চিঠি'র ভাদ্র ১৩৩৪ সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়

> ... আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়েনা। দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি, দেখতে পাই, হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে আছে। আমি সেটাকে সুশ্রী বলি এমন ভুল করোনা। কেন করিনে তার সাহিত্যিক কারণ আছে, নৈতিক কারণ এ স্থলে গ্রাহ্য না হতেও পারে। ... এখন মনটা ক্লান্ত উদ্‌ভ্রান্ত, পাপগ্রহের বক্র দৃষ্টির প্রভাব প্রবল - তাই এখন বাগ্‌বাত্যার দিগদিগন্তে ছড়াবার সখ একটুও নেই। সুসময় যদি আসে তখন আমার যা বলবার বলব।

রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেও 'শনিবারের চিঠি'র দল রবীন্দ্রনাথকে ছাড়েননি, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্ণা দিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'ওয়ালাদের অন্তরঙ্গতায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল 'রবীন্দ্র-জীবনী' তৃতীয় খণ্ডে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তা উল্লেখ করেছেন,

> এই সময়ে একদিন 'শনিবারের চিঠি'র দল কবির সহিত দেখা করিতে আসেন, ... বাহিরের লোক ভাবিল কবি এই দলে যোগ দিয়েছেন এবং সে সম্বন্ধে লোকে পত্র লিখিয়া কেফিয়ৎ দাবি করিল। ...

রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত নতুন বা আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে। যার এক স্থানে তিনি বলেছিলেন,

> .. সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ কেউ মনে করছেন নিত্য পদার্থ ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করেনা।.. এই ল্যাঙটপরা গুলি-পাকানো ধুলো মাখা আধুনিকতারই একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি হোলিখেলার দিনে চিৎপুর রোডে। ...
>
> মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে এরকম উল্লাস হয় ; কণ্ঠের অক্লান্ত উত্তেজনায় খুব একটা জোরও আছে, মাধুর্যহীন সেই রূঢ়তাকেই যদি শক্তির লক্ষণ বলে মানতে হয় তবে এই পালোয়ানির মাতামাতিতে বাহাদুরি দিতে হবে সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু ততঃ কিম। এ পৌরুষ চিৎপুর রাস্তার, অমরপুরীর সাহিত্য কলার নয়।

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধের উত্তর দান করেছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ১৩৩৪ ভাদ্র সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় 'সাহিত্য ধর্মের সীমানা' প্রবন্ধে। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রবন্ধের এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য খণ্ডন করে লিখেছিলেন,

> ... নতুন সাহিত্যকে 'বিদেশের আমদানী' বলিয়া কবিবর কটাক্ষ করিয়াছেন ; রবীন্দ্রনাথের কাছে একথা লইয়া কটাক্ষপাতের প্রত্যাশা করি নাই। আলো যদি আমার অন্তরে আসিয়া থাকে, তাহা কোন জানালা দিয়া আসিয়াছে তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, যদি সে আলো সত্য সত্যই আমার অন্তরে ভিতরকার মণিরত্ন উদ্ভাসিত করিয়া থাকে। ... যে সাহিত্যকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের এই সমরাভিযান, তাহাকে তিনি কেবল এক কথায় বিলাতের আমদানী বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন।... এই সাহিত্যের মধ্যে এমন অনেক লেখাই আছে যাহা নিঃশেষে দেশের জীবন ও সমাজের সত্য স্বরূপের রসমূর্তি.. যা'কে বিলাতের আমদানী বলা একটা নিষ্ঠুর পরিহাস. ...

ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে বিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে নবীন সাহিত্যিকেরা সামাজিক বাস্তবতা আনয়নের জন্যে যে প্রয়াস চালাচ্ছিলেন, 'কল্লোল', 'কালি-কলম' পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে তা জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। 'শনিবারের চিঠি'র তাতে গাত্রদাহ হয়ে থাকতে পারে কিন্তু যে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি রোমান্টিক কবিতার শ্রেষ্ঠ বাঙালি প্রতিভূ তাঁর কাছে বাইরের প্রভাবের অনীহা বাস্তবিকই আশাতীত, বিশেষত রবীন্দ্রনাথ নিজেই যখন ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর থেকে

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের অনেকটা সময় ইউরোপেই অতিবাহিত করেন।

সজনীকান্ত-মোহিতলাল শুধু রবীন্দ্রনাথকেই আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেননি তাঁরা শরৎচন্দ্রেরও দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ১৩৩৪ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে শরৎচন্দ্রের কাছে সজনীকান্তের পত্র ও তার উদ্ভবের পাদটীকায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের খবর ও তাঁর মতামত ছাপানো হয়,

> ... গত ২৪শে মাঘ তারিখে আমার শ্রদ্ধাভাজন কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের সহিত শরৎবাবুর রূপনারায়ণ নদীতীরস্থ গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র' ও 'কাজি নজরুল ইসলাম' সম্বন্ধে কথা হয়। ... তিনি বলিলেন, শিক্ষা দীক্ষাহীন অর্বাচীন ছেলেরা সাহিত্যের আবহাওয়া দূষিত করিলে সহ্য করা যায়, নজরুল ইসলামের অশিক্ষিত পটুত্ব তাঁহাকে কোনো বন্ধনের মধ্যে রাখিতে পারে না, কিন্তু নরেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মত পণ্ডিতজন যখন এই পঙ্কিলতার সৃষ্টি করেন তখনই তাহা মারাত্মক ওঠে।

উদ্ধৃতিটি থেকে বোঝা যায় আক্রমণের সাধারণ লক্ষ্য আধুনিক সাহিত্যকরা হলেও বিশেষ লক্ষ্য কাজী নজরুল ইসলাম। এর পেছনে সজনীকান্ত-মোহিতলালের ঈর্ষাজনিত মনোভাব সক্রিয় থাকতে পারে। যাই হোক, শরৎচন্দ্রের ঐ মতামত প্রকাশ করে উপসংহারের সজনীকান্ত আক্ষেপের সঙ্গে যা লিখেছিলেন তা খুবই কৌতুকপ্রদ,

> ... বাঙ্গলাদেশে শতকরা ৯৯ জনের কাছে অপঠিত থাকিয়াই যদি রবীন্দ্রনাথের যুগ চলিয়া যায়, মাসিকের পাতায় থাকিতে থাকিতেই যদি শরৎচন্দ্রের যুগের অবসান হয়, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের জীবিতাবস্থাতেই যদি নরেশচন্দ্র, দীনেশ রঞ্জন, নজরুল ইসলাম সহিত্য-যুগাবতার বলিয়া ঘোষিত হন (কয়েক মাস পূর্বে Forward পত্রিকায় শ্রীযুক্ত গিরিজা মুখোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত একটি প্রবন্ধে এই মর্মে লিখিত হইয়াছে, যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের যুগ শেষ হইয়াছে, নরেশচন্দ্র, দীনেশ রঞ্জন প্রভৃতি নূতন যুগাবতারণা করিতেছেন, কাজি নজরুল ইসলাম ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ইহার দুইটি wing তাহা হইলে সমাপ্ত হউক এই সাহিত্যের। বটতলার দেশে সাহিত্য চলিবেনা ইহা নিশ্চয় জানিয়া আমরা নিশ্চিত থাকিব।

শরৎচন্দ্র, নজরুল এবং আধুনিক লেখকদের সম্বন্ধে সজনীকান্ত-মোহিতলালকে

যাই বলে থাকুন না কেন, সে কথা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হলে শরৎচন্দ্র বড়ই বিব্রত বোধ করেন এবং এ প্রসঙ্গে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার ১৩৩৪ আশ্বিন সংখ্যায়' 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' নামক এক প্রবন্ধে নিজের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, "ইতিমধ্যে বিনা দোষে আমার অবস্থা করুণ হইয়া উঠিয়াছে। ... শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'তে আমার মতামত এমন প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন যে ঢোক গিলিয়া, মাথা চুলকাইয়া পালাইবার আর পথ রাখেন নাই। একেবারে বাঘের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন।" শরৎচন্দ্র সজনীকান্ত-মোহিতলালকে ঠিক কি বলেছিলেন জানা যায় না, তবে উল্লিখিত প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক লেখকদের বিতর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে আধুনিকদের পক্ষাবলম্বনই করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন,

> প্রিয়পাত্রেরা গিয়া কবিকে ধরিয়াছে, মশাই আমরা ত আর পারিয়া উঠিনা, এবার আপনি অস্ত্র ধরুন। না, না ধনুর্বাণ নয়, ধনুর্বাণ নয়,—গদা। ঘুরাইয়া দিন ফেলিয়া ওই অতি আধুনিক-সাহিত্যিক-পল্লীর দিকে। লক্ষ্য! কোন প্রয়োজন নাই। ওখানে একসঙ্গে অনেকগুলি থাকে।
>
> কবির সেই গদাটাই অন্ধকারে আকাশ হইতে পড়িয়াছে ইহাতে ইপ্সিত লাভ না হৌক শব্দ এবং ধূলা উঠিয়াছে প্রচুর। ... কবি ত থাকেন বারো মাসের মধ্যে তেরো মাস বিলাতে। কি জানেন তিনি কে আছে তোমাদের খড়গহস্ত শুচি-ধর্মী শৈলজা প্রেমেন্দ্র নজরুল কল্লোল কালিকলমের দল! কি করিয়া জানিবেন তিনি কবে কোন্ মহীয়সী জননী অতি আধুনিক সাহিত্যকে দলন করিতে ভবিষ্যৎ মায়েদের সূতিকাগৃহেই সন্তান বধের সদুপদেশ দিয়া নৈতিক উচ্ছ্বাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, দৈবাৎ এক আধটা টুকরো লেখা যাহা তাঁহার চোখে পড়িয়াছে তাহা হইতেই তাহার ধারণা জন্মিয়াছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আব্রুতা এবং আভিজাত্য দুই-ই গিয়াছে। শুরু হইয়াছে শুধু চিৎপুর রোডের খচোখচো-খচ্‌কার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃপুনঃ আবর্তিত গর্জন। আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কবির এতবড় অবিচার ... আমার বিস্ময় ও ব্যথার অবধি নাই।

উদ্ধৃত অংশ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শরৎচন্দ্রের সমর্থন ছিল আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতিই। রবীন্দ্রনাথের বারো মাসের মধ্যে তেরো মাস বিলাতে থাকার প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের উক্তি যথার্থ, ১৩৩৩-৩৪ সালে রবীন্দ্রনাথ পুনঃপুনঃ বিদেশ ভ্রমণে

যাচ্ছিলেন। যে 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধ বিতর্কের সৃষ্টি করে তা লিখে দিয়েই তিনি মালয় চলে যান, আর দেশে পত্র-পত্রিকায় চলতে থাকে তার জের। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধে "মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে মাধুর্যহীন রূঢ়তাকেই শক্তির লক্ষণ মনে করে পালোয়ানির মাতামাতি' উক্তিটি কোন্ সাহিত্যিকের উদ্দেশ্যে করেছিলেন সে সম্বন্ধে উল্লিখিত প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, "তবে এমনও হইতে পারে কবির লক্ষ্য নরেশচন্দ্র নহেন আর কেহ। কিন্তু সেই আর কেহরও সব বই তাঁহার পড়িয়া দেখা উচিৎ বলিয়া মনে করি।" ... এই 'আর কেহ' যদি কাজী নজরুল ইসলাম হয়ে থাকেন তাহলে নজরুল কাব্যের 'যৌবন বন্দনা'কে 'মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে মাধুর্যহীন রূঢ়তা' বা 'পালোয়ানির মাতামাতি' আখ্যাত করা 'শনিবারের চিঠি'র পক্ষে শোভন হলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অবশ্যই নয়। মোহিতলাল মজুমদার সত্য সুন্দর দাস ছদ্মনামে 'শনিবারের চিঠি'তে 'সাহিত্যের আদর্শ' এবং 'আত্মশক্তি'তে 'আধুনিক সাহিত্য ও শরৎচন্দ্র' নামে দু'টি প্রবন্ধ লেখেন ১৩৩৪ আশ্বিন সংখ্যায়, তাঁর বক্তব্যের সার কথা ছিল, "তিনি (শরৎচন্দ্র) নজরুল কল্লোল কালি-কলমের সৃষ্টিতে আস্থাবান যাহাদের রচনার প্রতি অক্ষরে কৃত্রিমতা।"

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ইন্দোনেশিয়া সফরে যাচ্ছিলেন বালি দ্বীপের পথে প্লানসিইউ জাহাজে বসে ২৩ আগস্ট তিনি 'যাত্রীর ডায়রী' শিরোনামে 'সাহিত্যে নবত্ব' নামে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিতে হয় ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের কোন কোন অংশে পরোক্ষভাবে নজরুলের প্রতি খোঁচা ছিল মনে হতে পারে। উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মোহিতলালের প্রশংসা করতে গিয়ে পক্ষান্তরে যেন নজরুলেরই সমালোচনা করেছেন,

> মোহিতলাল সাধারণের কাছে ইতিমধ্যেই খ্যাতিলাভ করেছেন। এই খ্যাতির কারণ তাঁর কাব্যের অকৃত্রিম পৌরুষ। অকৃত্রিম বল্‌চি এই জন্যে, তাঁর লেখায় তাল ঠোকা পাঁয়তারা-মারা পালোয়ান নেই। যথার্থ যে বীর, সে সার্কাসের খেলোয়াড় হতে লজ্জা বোধ করে। পৌরুষের মধ্যে শক্তির আড়ম্বর নেই, শক্তির মর্যাদা আছে ; বাহাদুরী নেই ...

এমনকি শৈলজানন্দের প্রশংসার ছলেও রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তাতেও নজরুলের 'দারিদ্র' কবিতার বক্তব্যকে পরিহাস করা হয়েছে বলে মনে হতে পারে,

> দেখেছি দরিদ্র-জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর আছে বলেই তাঁর রচনায় দারিদ্র্য ঘোষণার কৃত্রিমতা নেই। তাঁর বিষয়গুলি

> সাহিত্য সভার মর্যাদা অতিক্রম করে নকল দারিদ্র্যের সখের যাত্রার পালায় এসে ঠেকেনি। নবযুগের সাহিত্য নতুন একটা কাণ্ড করচি জানিয়ে পদভরে ধরণী কম্পমান করবার দাপট আমি তাঁর দেখিনি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে নজরুলের নাম উল্লেখ করেননি কিন্তু 'কল্লোল' গোষ্ঠির প্রিয় কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নজরুলের গজল রচনাকে যে ভাষায় সমালোচনা করেছেন তা বাস্তবিকই আশাতীত। 'শনিবারের চিঠি' পৌষ ১৩৩৪ সংখ্যায় 'তরুণের লজ্জা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন,

> তরুণ কবি নজরুলের তরুণত্ব যে আজ নবীন তুরস্কের অভিযান গীতি সম্পর্কে মৌন হয়ে প্রবীণ পারস্যের যৌন-গজলে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হল।

নজরুলের গজল সম্পর্কে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অনুরূপ ধারণা সম্ভবত 'শনিবারের চিঠি'র গজলগুলির প্যারডি ভিত্তিক, নজরুলের গজলগুলো পাঠ করে থাকলে অমন মন্তব্য হয়তো তিনি করতে পারতেন না। এসব সমালোচনা নজরুল অত্যন্ত সহিষ্ণুতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি এ সময়ে ইব্রাহিম খানের একটি পত্রের উত্তর দান প্রসঙ্গে 'সওগাত' ১৩৩৪ পৌষ সংখ্যায় তার সমালোচকের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন,

> ... অবশ্য কয়েকজন নোংরা হিন্দু ও ব্রাহ্ম লেখক ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে আমায় কিছুদিন হ'তে ইতর ভাষায় গালাগালি করছেন, এবং কয়েকজন গোঁড়া 'হিন্দু সভাওয়ালা' আমার নামে কুৎসা রটনাও ক'রে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু এঁদের আঙ্গুল দিয়ে গোনা যায়। এঁদের আক্রোশ সম্পূর্ণ সম্প্রদায় বা ব্যক্তিগত। এঁদের অবিচারের জন্য সমস্ত হিন্দু সমাজকে দোষ দিই নাই এবং দিবওনা। তা'ছাড়া আজকার সাম্প্রদায়িক মাত্‌লামির দিনে আমি যে মুসলমান এইটেই হয়ে পড়েছে অনেক হিন্দুর কাছে অপরাধ,—যত বেশি অসাম্প্রদায়িক হই না কেন।

বস্তুত নজরুল-প্রমীলার বিয়ের সময় থেকে গোঁড়া হিন্দু ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর সাহিত্যিক নজরুলের ওপরে যে খড়গহস্ত হন সে আঘাত নজরুলের ওপরে পতিত হয় বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হানাহানির দিনে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ রবীন্দ্র পরিষদে এক সংবর্ধনার উত্তরে বাংলা কবিতায় 'খুন' শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এক মন্তব্যে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর (২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪) প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্রনাথ যা

বলেছিলেন তা এক এক কাগজে এক এক রকম ছাপা হয়। 'প্রবাসী'তে (ফাল্গুন ১৩৩৪) 'প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের অভ্যর্থনার উত্তরে আচার্য রবীন্দ্রনাথের মৌখিক অভিভাষণের ছাত্রগণ গৃহীত বস্তু সংগ্রহ হইতে কবির স্বকৃত লিখিতানুবৃত্তি'র বিবরণী প্রকাশিত হয় তাতে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছিলেন,

> ... সেদিন কোন একজন বাঙ্গালী হিন্দু কবির কাব্যে দেখলুম তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন 'খুন'। পুরাতন 'রক্ত' শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙ্গা রং যদি না ধরে তা হলে বুঝব সেটাকে তাঁরি অকৃতিত্ব। তিনি রঙ্গ লাগাতে পারেন না বলেই তাক্ লাগাতে চান। আমি তরুণ বলব তাঁদেরই যাঁদের উষাকে নিয়ুমার্কেটে 'খুন' ফরমাস করতে হয়না।

'বাঙ্গলার কথা' পত্রিকায় 'খুন' শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য কিছুটা ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছিল, অর্থাৎ যে কবির কাব্যে 'খুন' শব্দের ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন উক্ত পত্রিকার রিপোর্ট অনুসারে তাঁকে নজরুল ইসলাম বলে মনে হতে পারে। 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাসের প্রতিবেদন অনুসারে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

.. সেদিন কোন একজন বাঙ্গালী কবির কাব্যে দেখলুম, তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন 'খুন'।

অথচ দেখা যাচ্ছে যে 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়েছিল "একজন বাঙালী হিন্দুকবির' আর অন্যান্য পত্রিকায় 'একজন বাঙ্গালী কবির', সুতরাং নজরুলের পক্ষে এটা ভাবা অস্বাভাবিক ছিল না যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উদ্দেশ্যে করেই ও কথা বলেছেন। নজরুল ১৩৩৩ সালের গোড়ার দিকে (২২ মে ১৯২৬) লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত গান 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', যে গানে আছে, 'কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ওই পলাশির প্রান্তর, বাঙ্গালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর।" গানটি রবীন্দ্রনাথকে নজরুল শুনিয়েছিলেন এবং তা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কাজেই রবীন্দ্রনাথের ভাষণ থেকে নজরুলের এমন ধারণা হওয়া বিচিত্র নয় যে তাঁর রচনায় 'খুন' শব্দের ব্যবহার দেখেই রবীন্দ্রনাথ ঐ মন্তব্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভাষণ দিয়েছিলেন ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ আর নজরুল নিজেকে রবীন্দ্র সমালোচনার লক্ষ্য বিবেচনা করে 'আত্মশক্তি' পত্রিকার ১৪ পৌষ সংখ্যায় 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম', 'সাহিত্যে নবত্ব' এবং 'রবীন্দ্র পরিষদের

অভিভাষণ'-এর উত্তর দান করেন। নজরুলের দীর্ঘ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সুন্দর সম্পর্ক এবং তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহে কি করে কোন নামকরা কবি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন, কি করে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা শত্রু হয়ে গেলেন তার পরিচয় দেন। তা ছাড়া 'শনিবারের চিঠি'র 'গাড়োয়ানি রসিকতা' এবং 'মেছোহাটা থেকে টুকে আনা গালি'র প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নিজেকে 'এ গালির গালিচাতে .. এ কালের সর্বশ্রেষ্ঠ শাহানশাহ্' আখ্যা দেন। আলোচ্য প্রবন্ধে 'খুন' শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি খণ্ডন করে নজরুল লেখেন,

> ... আজকের 'বাঙ্গলার কথায় দেখলাম, তিনি বলেছেন, আমি কথায় কথায় রক্তকে 'খুন' বলে অপরাধ করেছি। কবির চরণে ভক্তের সশ্রদ্ধ নিবেদন, কবি ত নিজেও টুপি পায়জামা পরেন, অথচ আমরা পরলেই তাঁর এত আক্রোশের কারণ হয়ে উঠে কেন, বুঝতে পারিনি। এই আরবি-ফার্সি শব্দ প্রয়োগ কবিতায় শুধু আমিই করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রাথ প্রভৃতি করে গেছেন।।
>
> আজ আমাদের মনে হচ্ছে আজকের রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই চির চেনা রবীন্দ্রনাথ নন। তাঁর পিছনের বৈয়াকরণ পণ্ডিত এ সব বলাচ্ছে তাঁকে। 'খুন' আমি ব্যবহার করি আমার কবিতায়, মুসলমানি বা বলশেভিকী রং দেওয়ার জন্য নয়। হয়ত কবি ও দুটোর একটারও রং আজকাল পছন্দ করছেন না, তাই এত আক্ষেপ তাঁর। আমি শুধু 'খুন' নয় বাংলায় চলতি আরো অনেক আরবি ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। আমি মনে করি, বিশ্ব-কাব্যলক্ষ্মীর একটা মুসলমানী ঢং আছে। ও-সাজে তাঁর শ্রীর হানি হয়েচে বলেও আমার জানা নেই। ... আজকের কলা লক্ষ্মীর প্রায় অর্ধেক অলঙ্কারই ত মুসলমানী ঢং-এর। পণ্ডিত মালবিয়া স্বীকার করতে না পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ স্বীকার করবেন। তাছাড়া যে 'খুনের' জন্য কবিগুরু রাগ করেছেন, তা দিনরাত ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তা 'খুন করা', 'খুন হওয়া' ইত্যাদি খুনোখুনি ব্যাপারেই নয়। হৃদয়েরও খুন খারাবী হতে দেখি আজো। এবং তা শুধু মুসলমান পাড়া লেনেই হয় না।

নজরুলের ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গান শোনানোর কথা এবং ঐ গানে 'রক্তে'র বদলে 'খুন' শব্দ ব্যবহারের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ ছিল। 'সাহিত্যে

নবত্ব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে দরিদ্র-জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছিলেন নজরুল আলোচ্য প্রবন্ধে সে সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখেন,

> ... ওঁর আমাদের উদ্দেশ্য করে আজকালকার লেখাগুলোর সুর শুনে মনে হয়, আমাদের অভিশপ্ত জীবনের দারিদ্র্য নিয়েও যেন তিনি বিদ্রূপ করতে শুরু করেছেন। আমাদের এই দুঃখকে কৃত্রিম বলে সন্দেহ করবার প্রচুর ঐশ্বর্য তাঁর আছে, জানি এবং এও জানি, তিনি জগতের সবচেয়ে বড় দুঃখ ঐ দারিদ্র্য ব্যতীত হয়ত আর সব দুঃখের সাথেই অল্পবিস্তর পরিচিত। তাঁর কাছে নিবেদন, তিনি যত ইচ্ছা বাণ নিক্ষেপ করেন, তা হয়তো সইবে, কিন্তু আমাদের একান্ত আপনার এই দারিদ্র্য-যন্ত্রণাকে উপহাস করে যেন আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে না দেন। শুধু এই নির্মমতাটাই সইবে না। কথাসাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্র 'শনিবারের চিঠি'ওয়ালাদের কাছে আমায় গালিই দিন আর যা-ই করুণ (জানিনা এসংবাদ সত্য কি-না), ঐ দারিদ্রটুকুর অসম্মান তিনি করতে পারেননি।

নজরুল উল্লেখিত 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধে তাঁর সমালোচকদের বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন। বিষয়টি বহুদূর গড়িয়ে যাওয়ায় এবং তর্ক-বিতর্ক অপ্রীতিকর ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ায় তা অবসানের জন্যে মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে আসেন প্রমথ চৌধুরী, 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় (২০ মাঘ ১৩৩৪) 'বঙ্গ সাহিত্যে খুনের মামলা' নামক একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন,

> ... কাজি সাহেব বলেছেন যে, 'কবিগুরু বলেছেন কথায় কথায় রক্তকে খুন বলে অপরাধ করেছি।' কবিগুরু হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ! রবীন্দ্রনাথ যে কাজি সাহেবকে লক্ষ্য করে এ কথা বলেছেন,—এ সন্দেহ আমার মনে উদয় হয়নি, যদিচ যে-সভায় তিনি ও-কথা বলেন সে সভায় আমি উপস্থিত ছিলুম। যতদূর মনে পড়ে, কোনও উদীয়মান তরুণ কবির নবীন ভাষার উদাহরণস্বরূপ তিনি 'খুনের' কথা বলেন। কোনও উদিত কবির প্রতি তিনি কটাক্ষ করেননি। ... বাংলা কবিতায় যে 'খুন' চলছেনা এমন কথা আর যেই বলুন রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন না, কারণ কাজি সাহেব এ পৃথিবীতে আসবার বহু পূর্বে নাবালক ওরফে বালক রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মিকী প্রতিভা' নামক যে কাব্য রচনা করেছিরলেন, তার পাতা উল্টে গেলে 'খুনে'র সাক্ষাৎ পাবেন। কিন্তু এসব খুন এত বেমালুম খুন যে, হঠাৎ তা কারও চোখে পড়েনা।
>
> ... তারপর কাজি সাহেব এই বলে দুঃখ করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার

> অন্তরে আরবি ফার্সি শব্দের প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করতে চান। কাজি সাহেবের এ বিলাপ প্রলাপ মাত্র। কেননা, যদি তাঁর ও রকম কোনও কুমতলব থাকত তাহলে তিনি বহু পূর্বে আমার ভাষার উপর খড়গহস্ত হতেন। ...
>
> কাজি সাহেব আমাদের বেশের উপর মুসলমান বেশের প্রভাবের কথা বলেছেন তা সবই সত্য, কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক।

উপসংহারে প্রথম চৌধুরী 'খুনের' একটা 'গুণের' উল্লেখ করেন যেটি রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেননি, বাংলা ভাষায় খুনের যত মিল পাওয়া যায়, রক্তের তার শতাংশের একাংশেও পাওয়া যায় না। অতএব কবিতায় যদি খুন বাদ দিতে হয়, তাহলে 'রিজন'-এর খাতিরে 'রাইম' কে তালাক দিতে হয়। আর কে না জানে 'রাইম'-এর খাতিরে রিজন' এর সাত খুন মাপ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের ব্যক্তিগত সম্পর্কের উন্নতি ঘটলেও ১৩৩৪ সালের শেষ অবধি সাহিত্যে নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব চলতে থাকে এবং তা অবসানের জন্যে ১৩৩৪ সালের ৪ঠা ও ৭ই চৈত্র বিশ্বভারতী সম্মেলনের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্র' ভবনে সাহিত্যিকদের সভা বসে, উপস্থিতিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অপূর্বকুমার চন্দ, প্রশান্তচন্দ্র মহালনবীশ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, অমল হোম, সজনীকান্ত দাস, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। সভার প্রথম দিনের আলোচনার একটি বিকৃত রিপোর্ট 'বাংলার কথা' (৬ চৈত্র, ১৩৩৪) সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ, উভয় দিনের তাঁর বক্তৃতা এবং অন্যদের প্রশ্নোত্তর লিখে প্রকাশ করেন ('সাহিত্য রূপ' এবং 'সাহিত্য সমালোচনা'-'প্রবাসী' বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫)। এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি যেমন আধুনিকতার উগ্র তামসিকতাকে সমর্থন করেননি, তেমনি আবার সাহিত্য সমালোচনায় সাহিত্যিক পদ্ধতির অনুসৃতি কামনা করেছিলেন।

দার্জিলিং-এ রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

কবি আবদুল কাদির 'নজরুল-রচনা-সম্ভার' গ্রন্থে 'রবীন্দ্র-নজরুল সম্পর্ক' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> রবীন্দ্রনাথ একদিন আলাপ-প্রসঙ্গে নজরুলকে তুলনা করেন ইতালীয় কবি দ্যনুনজিও'র সঙ্গে। নজরুল ১৩৩৭ সালের আষাঢ় মাসে শ্রীমন্মথ রায়, শ্রীঅবনী রায়, শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রীপ্রবোধ গুহ সমভিব্যাহারে দার্জিলিঙে রবীন্দ্রনাথের

> সঙ্গে দেখা করতে গেলে রবীন্দ্রনাথ স্নেহের সুরে তাঁকে বলেন : 'ইতালীতে এক দ্বীপের মাঝখানে বাস করেন দ্যনুনজিও ; তিনি তোমার চাইতেও পাগল।'

কবি আবদুল কাদির পরিবেশিত উপর্যুক্ত তথ্য অনুসারে নজরুল ১৩৩৭ সালের আষাঢ় মাসে দার্জিলিং-এ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 'রবীন্দ্র-জীবনী' তৃতীয় খণ্ডে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী',রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ থেকে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের বাইরে ইউরোপ, সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা সফর করেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পরিবেশিত তথ্যানুযায়ী রবীন্দ্রনাথ ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে মাসখানেক দার্জিলিং-এ ছিলেন, কবি দার্জিলিং থেকে ১৩৩৮ সালের আষাঢ় মাসে (১৩৩৭ সালে নয়) ফিরে আসেন। আবদুল মান্নান সৈয়দ 'লেখার রেখায় রইল আড়াল' সংকলনটির ভূমিকা 'মুখবন্ধ' কলকাতার নজরুল গ্রন্থের আদি প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী গোপালদাস মজুমদারের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন, নজরুল প্রথমে শিলং যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁর সঙ্গে কিন্তু পরে কালিকা টাইপ ফাউণ্ডারীর মালিক মনোরঞ্জন বাবুর সঙ্গে দার্জিলিং যান। সে সময়ে সে কালের স্বনামধন্য সুন্দরী ও বিদুষী জাহানারা বেগম চৌধুরীও দার্জিলিং গিয়েছিলেন, যাঁর পরিবারের সঙ্গে নজরুলের হৃদ্যতা ছিল। জাহানারা বেগম চৌধুরী প্রথমে 'রূপরেখা' এবং পরে 'বর্ষবাণী' নামে বার্ষিক পত্রিকার সম্পাদিকা এবং কলকাতার সাহিত্যিক মহলে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। আবদুল মান্নান সৈয়দ দার্জিলিং ভ্রমণ সম্পর্কে জাহানারা চৌধুরীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন,

> একবার কবিদা দার্জিলিঙে আমাদের সঙ্গে মাস দুয়েক ছিলেন। সেটা ছিল ১৯৩১ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস। তখন রবীন্দ্রনাথও দার্জিলিঙে দিনেন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী সহ সপরিবারে ছিলেন। প্রফেসর সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রও কাছাকাছি থাকতেন। কবিদা আমাদের সঙ্গে নিয়ে প্রায়ই গুরুদেবের ওখানে যেতেন দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে গান-বাজনা এবং কবিতা নিয়ে বিশেষত আরবি-ফারসি কবিতার ছন্দ ও গজল ইত্যাদি গানের সুর সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা হত। প্রফেসর সুরেন মৈত্রের মেয়ে নোটন মৈত্রের পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বিশেষ দখল ছিল। নোটনদি খুব ভালো পিয়ানো বাজাতেও পারতেন। ওঁদের কাছে প্রায় রোজই যেতে হত, পিয়ানো না শুনিয়ে কবিদার কাছ থেকে নোটনদির রেহাই ছিলনা।

নজরুল দু'মাস নয়, একমাসের মতো ১৯৩১ সালের জুনের মাঝামাঝি থেকে জুলাইয়ের মাঝামাঝি দার্জিলিং ছিলেন ; তবে দার্জিলিং শৈলাবাস নজরুলের জন্যে মধুর হয়ে উঠেছিল। জাহানারা চৌধুরীর এবং ঢাকার পূর্ব পরিচিতি নোটনের কারণে, আর গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, সাক্ষাতের জন্যে।

আবদুল মান্নান সৈয়দ পূর্বোল্লেখিত মুখবন্ধে লিখেছেন,

> প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯৯২) লিখেছেন, 'মাসেককাল দার্জিলিঙ বাস করিয়া জুলাই মাসের গোড়াতেই কবি [রবীন্দ্রনাথ] শান্তিনিকেতন ফিরিলেন। অর্থাৎ ১৯৩১ সালের মোটামুটি জুন মাস-ভোর রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিংয়ে ছিলেন জুন মাসের দ্বিতীয়ার্ধে কোনো সময় নজরুল সদলবলে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। প্রভাতকুমার লিখেছেন, 'দার্জিলিঙে এবার নজরুল ইসলাম, নাট্যকার মন্মথ রায় ও শিল্পী অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো) ভ্রমণে আসেন। নজরুলকে পাইয়া খুবই খুশি—বহুক্ষণ নানা বিষয়ের আলোচনা হয়। প্রভাতকুমারই জানিয়েছেন, 'নজরুল এই সাক্ষাৎকারের কথা ১৩৩৮ সালের 'স্বদেশ' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রবন্ধকারে প্রকাশ করেন। 'স্বদেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল ২৭ অক্টোবর ১৯৬৭ তারিখে কবি আবদুল কাদিরকে এক পত্রে লেখেন, 'বেশ মনে আছে, নজরুলের 'রবীন্দ্র-সন্নিধানে' আমি ছেপেছিলুম।' 'স্বদেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের এই 'রবীন্দ্র-সন্নিধানে' প্রবন্ধটি এখনো উদ্ধার করা হয়নি। ঐ পত্রে প্রবোধ সান্যাল 'স্বদেশে' প্রকাশিত অখিল নিয়োগীর 'রবীন্দ্রসকাশে' (ভাদ্র ১৩৩৮) প্রবন্ধটির হদিস দেন ; অখিল নিয়োগীর 'রবীন্দ্র স্মৃতিকথা' নামে আরেকটি লেখা প্রকাশিত হয়। 'শিক্ষাব্রতী' পত্রিকায় (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০) ; অখিল নিয়োগীর অন্য আরেকটি রচনার সন্ধান আমরা পেয়েছি— তার প্রাসঙ্গিক অংশ :
>
> সে বছর আমরা কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু মিলে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমাদের সেই দলে কাজীদা আর নাট্যকার মন্মথ রায়ও ছিলেন. কলকাতার এক প্রকাশক কাজীদার ওপর ভার দিয়েছিলেন, হজরত মুহম্মদের (সা.) জীবনী কবিতায় রচনা করতে। কথা ছিল— দার্জিলিং-এ নিরিবিলিতে বসে কাজীদা বইখানি শেষ করবেন।
>
> ওখানে পৌঁছে কাজীদার আর এক মূর্তি দেখলাম। দিনরাত আমাদের নিয়ে

হুল্লোড় আর সন্ধ্যাবেলায় গানের আসর বসানো। গানে গানে আমাদের অন্তর ভরে গেল।

যে প্রকাশকের বই লেখার বায়না নিয়ে কাজীদা দার্জিলিং গিয়েছিলেন, তিনিও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু কাজীদার বই না শুরু করার দরুন তিনি আমাদের ওপর খুব বিরক্ত হয়ে উঠলেন—সারাদিন যদি গান, গল্প আর হুল্লোড়ই চলবে তবে নজরুল গ্রন্থ রচনা করবেন কখন? তাঁর সময় ও অর্থ এইভাবে অপচয় হওয়ায় তিনি আমাদের ওপর একেবারে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

ঠিক এই সময়েই আবার খবর পাওয়া গেল, 'নাট্য-নিকেতনে'র প্রবোধ চন্দ্র গুহ দলবল নিয়ে দার্জিলিং এসে হাজির হয়েছেন। সেই দলে রয়েছেন নীহারবালা।

যাকে বলে নরক একেবারে গুলজার হয়ে উঠল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রবোধ গুহের ওখানে গানের আসর বসত। তিনি আবার নানারকমের মুখরোচক খাবারের আয়োজন করতেন। আর সেই সঙ্গে চলত অফুরন্ত গান।

নীহারবালার কণ্ঠে কারাগার-এর সেই গানগুলি নতুন করে জীবন্ত হয়ে উঠল। আমরা সবাই সুরের সাগরে সাঁতরাতে শুরু করে দিলাম। নীহারবালা থামেন তো কাজীদা আবার হারমোনিয়াম টেনে নেন, সে যেন একেবারে বাধা-বন্ধনহীন গানের ফোয়ারা।

ডাবরভর্তি পান, পাশে জরদার কৌটা, ঘন ঘন গরম চায়ের পেয়ালা আর সেই সঙ্গে সংগীতের সুরধুনী ধারা। দার্জিলিং-এ নজরুল সাহচর্যে যে আমরা কী আনন্দ পেয়েছি তা কোনোদিনের তরে ভুলতে পারব না।

এর ওপর আবার সোনায় সোহাগা, হঠাৎ আমরা খবর পেলাম, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং শহরে বেড়াতে এসেছেন।

আমরা সবাই কাজীদাকে ধরলাম, তীর্থযাত্রায় যেমন পাণ্ডার প্রয়োজন তেমনি কবি-সংগমে আর এক কবির সঙ্গী হওয়াই সবচাইতে প্রশস্ত আর মঙ্গলজনক।

কাজীদা হো হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠলেন। বললেন—বেশ, কবির পায়ের ধুলো নিতে যাবে এর জন্যে আবার দিন-ক্ষণ দেখবার প্রয়োজন কি? কাল খুব ভোরে উঠেই যাত্রা করা যাক। এত সহজে কাজীদা যে রাজি হবেন, আমরা ভাবতে পারিনি। তাই আমরা সকলেই খুব উল্লসিত হয়ে উঠলাম।

পরদিন ভোরে উঠে আমরা কাজীদাকে দলপতি করে কবি সন্দর্শনে রওনা হলাম।

কবি যে বাড়িতে অবস্থান করছিলেন, সেটা আমাদের অঞ্চল থেকে বেশ খানিকটা উঁচু। তাই আমাদের ওপরের দিকে উঠে যেতে হল। যথাসময়ে সেখানে পৌঁছে খবর পাঠাতেই কবি তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলেন। তিনি হয়তো কিছু লিখছিলেন, কিন্তু কবি নজরুলের নাম শুনেই আমাদের তাড়াতাড়ি দর্শনদান করলেন।

আমরা এগিয়ে গিয়ে কাজীদার অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথের পায়ের ধুলো নিলাম। সেই বছর রবীন্দ্রনাথ ৭০ বছরে পদার্পণ করেছেন। ...

আমরা অবাক হয়ে কবিকে দেখছিলাম। কী চওড়া হাতের কবজি, একেবারে দুধে আলতা গোলা রঙ। মনে হল প্রাচীন ভারত থেকে কোন ঋষি এসে যেন আবির্ভূত হয়েছে আমাদের মধ্যে। তখন দুই কবির মধ্যে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়। আমরা সবাই নীরব শ্রোতা।

কত-যে সরস আলোচনা চলতে লাগল, আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুধু শুনে যেতে লাগলাম।

এই দার্জিলিং শহরে এসে আমরা বাংলার দুই কবিকে যে একসঙ্গে পাবো তা ভাবতেই পারিনি।

এই দুর্লভ সৌভাগ্যের জন্য আমরা মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানালাম। ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথের কালে, নজরুলের সময়ে জন্মেছিলাম—তাই এই বিরল সৌভাগ্যে আমরা ধন্য হলাম।

সেদিন কবি কৌতুকে আর রসাল আলাপনে সরব হয়েছিলেন। বিশেষ করে নজরুলকে কাছে পেয়ে তাঁর আনন্দের পরিসীমা ছিল না।

বহু বিষয় নিয়ে সেদিন কথোপকথন চলছিল।

নজরুল তখন কি জাতীয় গান লিখছেন, রঙ্গমঞ্চে সে সময় কিরকম গান চলছে--দেশে নতুন সাহিত্য কি সৃষ্টি হচ্ছে—আমাদের দেশের নাটক এখন কোন পর্যায়ে আছে, এসব বিষয় নিয়েও দুই কবিতে আলোচনা চলেছিল।

এই সরস আলোচনার মধ্যে বিদেশী সাহিত্যের কথাও উঠেছিল। প্রসঙ্গক্রমে

কাজীদা ইটালীর কবি দাননুৎসীওর কথা তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করলেন, ওঁর লেখা পড়েছি, বড্ড বেপরোয়া।

রবীন্দ্রনাথ কাজীদাকে শান্তিনিকেতনে যেতে অনুরোধ জানালেন। কাজীদা বললেন, 'নিশ্চয়ই যাবো।'

রবীন্দ্র-নজরুল পত্রালাপ

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে নজরুল কলকতার সাপ্তাহিক 'নাগরিক' পত্রিকার ২য় বর্ষ ১ম বার্ষিক সংখ্যার জন্যে লেখা চেয়ে রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ১৩৪২ সালের ১৫ ভাদ্র (আগস্ট, ১৯৩৫ খ্রি.) নজরুলকে সে পত্রের উত্তর দেন,

কল্যাণীয়েষু,

অনেকদিন পরে তোমার সাড়া পেয়ে মন খুশী হোলো। কিছু দাবী করেছ— তোমার দাবী অস্বীকার করা আমার পক্ষে কঠিন। আমার মুস্কিল এই, পঁচাত্তরে পড়তে তোমার এখনো অনেক দেরী আছে, সেইজন্য আমার শীর্ণ শক্ত ও জীর্ণ দেহের পরে তোমার দরদ নেই। কোনো মন্ত্রবলে বয়স বদল করতে পারলে তোমার শিক্ষা হোতো। কিন্তু মহাভারতের যুগ অনেক দূরে চলে গেছে, এখন দেহেমনে মানব সমাজকে চলতে হয় সায়েন্সের সীমানা বাঁচিয়ে। ...

তুমি তরুণ কবি, এই প্রাচীন কবি তোমার কাছ থেকে আর কিছু না হোক, করুণা দাবী করতে পারে। অকিঞ্চনের কাছে প্রার্থনা করে, তাকে লজ্জা দিও না। এই নতুন যুগে যুগে যে সব যাত্রী সাহিত্য-তীর্থে যাত্রা করবে, পাথেয় তাদের নিজের ভিতর থেকেই সংগ্রহ করতে হবে।

শুনেছি বর্ধমান অঞ্চলে তোমার জন্ম। আমরা থাকি তার পাশের জিলায়— কখনও যদি ঐ সীমানা পেরিয়ে আমাদের দিকে আসতে পারো খুশী হব। স্বচক্ষে আমার অবস্থাও দেখে যেতে পারবে। ইতি ১৫ই ভাদ্র,১৩৪২

স্নেহরত

ররবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নজরুল ঐ চিঠি পেয়ে খুবই অভিভূত হয়ে পড়েন এবং 'তীর্থপথিক' নামক একটি কবিতার মাধ্যমে 'রবীন্দ্রনাথের পত্রের উত্তর' দেন, কবিতাটি 'নাগরিক' পত্রিকার

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যায় (১৩৪২) মুদ্রিত হয়েছিল। কবিতাটির প্রথম ও শেষ অংশ,

হে কবি, হে ঋষি অন্তর্যামী, আমারে করিও ক্ষমা !
পর্বত-সম শত দোষ-ত্রুটি ও চরণে হল জমা।
জানি জানি তার ক্ষমা নাই, দেব, তবু কেন মনে জাগে
তুমি মহর্ষি করিয়াছ ক্ষমা আমি চাহিবার আগে ! ...

তুমি স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির বিশ্বের বিস্ময়,—
তব গুণ-গানে ভাষা-সুর যেন সব হয়ে যায় লয়।
তুমি স্মরিয়াছ ভক্তেরে তব, এই গৌরবখানি
রাখিব কোথায় ভেবে নাহি পাই, আনন্দে মূক বাণী।
কাব্যলোকের বাণী বিতানের আমি কেহ নহি আর,
বিদায়ের পথে তুমি দিলে তবু কেন এ এ আশিস হার ?
প্রার্থনা মোর, যদি আবার জন্মি এ ধরণীতে,
আসি যেন শুধু গাহন করিতে তোমার কাব্য-গীতে ! !

রবীন্দ্রনাথের প্রতি নজরুলের মনোভাবের অকৃত্রিম পরিচয় ফুটে উঠেছে কবিতাটিতে।

এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের '১৪০০ সাল' কবিতার উত্তরে নজরুলও লিখেছিলেন '১৪০০ সাল' কবিতা। শতবর্ষ পরের পাঠককে রবীন্দ্রনাথ বসন্তের পুষ্পাঞ্জলি পাঠিয়েছিলেন, তাঁর সে দান গ্রহণ করে নজরুল পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

রবীন্দ্র-নজরুল সম্পর্ক বরাবর সৌহার্দ্যের ; রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে যে কি স্নেহ করতেন তার একটি উদারহরণ রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি ছায়াছবিতে নজরুলের সঙ্গীত পরিচালনায় অন্তর্ভুক্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের আপত্তি সত্ত্বেও সে ছবির মুক্তিলাভ। ঐ ছবির নির্মাতা নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে নিয়ে নজরুল সরাসরি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে চলে যান এবং তাঁর অনুমোদন নিয়ে আসেন। ফলে ছবিটি প্রদর্শনীর বাধা দূর হয়। বস্তুত, 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাস এবং মোহিতলাল মজুমদারের ঈর্ষান্বিত প্রয়াসে আধুনিক সাহিত্য নিয়ে বিতর্কে আর বঙ্গসাহিত্যে খুনের মামলা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি

ছাড়া ১৯২০ থেকে ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পূর্ব কাল পর্যন্ত রবীন্দ্র-নজরুল সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক স্নেহ ও শ্রদ্ধার। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে নজরুল যে কি গভীর ভাবে শোকাভিভূত হয়েছিলেন তার পরিচয় ১৩৪৮ সালের ২২ শ্রাবণ (১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে) রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত নজরুলের বিভিন্ন কবিতা ও গানে পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-প্রয়াণে 'রবিহারা' কবিতায় নজরুল লিখেছিলেন,

দুপুরের রবি পড়িয়াছে ঢলে অস্ত পথের কোলে
শ্রাবণের মেঘ ছুটে' এল দলে দলে
উদাস গগন-তলে।
বিশ্বের রবি ভারতের কবি,
শ্যাম বাংলার হৃদয়ের ছবি
তুমি চলে যাবে বলে। ...
শুনেছি, সূর্য্য নিভে গেলে হয় সৌরলোকের লয় ;
বাংলার রবি নিভে গেল আজ, আর কাহারও নয়।
বাঙালী ছাড়া কি হারালো বাঙালী কেহ বুঝিবে না আর,
বাংলা ছাড়া এ পৃথিবীতে এত উঠিবে না হাহাকার। ...
আমরা তোমাকে ভেবেছি শ্রীভগবানের আশীর্বাদ,
সে আশিস যেন লয় নাহি করে মৃত্যুর অবসাদ।...

কবিতাটি নজরুল কলকাতা বেতারে আবৃত্তি করেন, সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রামোফোনে রেকর্ডও হয়। নজরুলের আবৃত্তি শুনলে বোঝা যায় রবীন্দ্র-প্রয়াণে নজরুল কতটা অভিভূত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত নজরুলের গান 'ঘুমাইতে দাও শান্ত কবিরে, জাগায়োনা, জাগায়োনা' অত্যন্ত বেদনাময় আবহের গান। নজরুল এই গানটি ইলা ঘোষ, সুনীল ঘোষ প্রমুখ শিল্পীকে নিয়ে রেকর্ড করেন ; গানটি বেতারেও প্রচারিত হয়। এ ছাড়াও তিনি 'সালাম অস্তরবি' এবং 'মৃত্যুহীন রবীন্দ্র' নামে আরও দুটি কবিতা রচনা করেন ; শোকসভায় যোগ দেন, সভাপতিত্ব করেন। স্মরণীয় যে রবীন্দ্র-প্রয়াণের এক বছরের মধ্যে ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে নজরুলও অসুস্থ এবং ক্রমান্বয়ে সম্বিতহারা ও নির্বাক হয়ে যান। বাংলার দুই মহান কবির কণ্ঠ প্রায় একই সময়ে নীরব হয়ে যায়।